সমাজ-রূপান্তরের প্রশ্ন

- মোহাম্মদ আনিসুর রহমান

১. ভূমিকা

বিগত শতাব্দীতে বিশ্বে দুটো বড়ো অঘটন ঘটেছে। একটা হল মার্কস-লেনিনবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লবী প্রচেষ্টার শোচনীয় পরিণতি; দ্বিতয়টি হল তথাকথিত 'উন্নয়নশীল' দেশসমূহে 'উন্নয়ন' প্রচেষ্টা সম্বন্ধেও মোহমুক্তি।

বিগত শতাব্দীর শেষ রজনীতেই বিজয়ী সমাজদর্শন - পুঁজিবাদ - তার জয়বার্তা ঘোষণা করে 'বিশ্বায়নের' ডাক দিয়ে, যার অর্থ জাতীয় এবং বিশ্বমানব কল্যানের প্রশ্নকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দেশের ভেতরে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে লেন-দেনএ ব্যক্তি পুঁজি, বিশেষ করে করপোরেট পুঁজির, অবাধ শিকারের জন্য বাজারকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেয়া। কিছু সময়ের জন্য এর বিরুদ্ধে তেমন কোন সাড়া শোনা যায় নি, কিন্তু শতাব্দী মোড় নিতে না নিতেই প্রতিরোধের আলো জ্বলে ওঠে সিয়াট্‌ল্‌-ওয়াশিংটনের প্রতিবাদ-স্ফুলিঙ্গে। আজকে নতুন মিলেনিয়ামের প্রত্যুষে আমরা কোথায় আছি এবং আমাদের সামনের ডাকটা কী এই প্রশ্নটা আলোচনা বাঞ্ছনীয়। এই লক্ষ্যে আমি বর্তমান নিবন্ধে বিগত শতাব্দীতে সমাজ পরিবর্তনের যে সব পরীক্ষা ও প্রচেষ্টা হয়েছে এবং আজ আমরা কোথায় আছি সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব, বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছে তার অন্তর্নিহিত সমাজ-দর্শন আলোচনা করব, এবং বর্তমান পর্যায়ে সমাজ-রূপান্তরের জন্য কাজের প্রধান ক্ষেত্র প্রস্তাব এবং কিছু দর্শনগত প্রশ্ন উত্থাপন করব।

২. সমাজ পরিবর্তন এবং 'উন্নয়ন'-এর এক্সপেরিমেন্ট

মানব ইতিহাসে সমাজ-কাঠামো ও সমাজ-চরিত্র নিয়ে সংলাপের শুরু থেকেই মুনি-ঋষি পয়গম্বর থেকে শুরু করে সমাজ-চিন্তাবিদ্‌-দার্শনিকগণ বৃহত্তর মানব কল্যাণে সমাজ-চরিত্র পবিরর্তনের ডাক দিয়েছেন। তাঁরা সমাজের এমন চরিত্র চেয়েছেন যেখানে পার্থিব সম্পদের আকর্ষনের চাইতে মানবিক গুণাবলীর মূল্য কম হবে না। তাঁদের ডাকে ছোট-খাট অনুসারী দল কোথাও কোথাও কখনো কখনো সাড়া দিয়েছে, কিন্ত সামগ্রিকভাবে এতে সমাজের চরিত্র বদলায় নি। বিগত দুই শতাব্দী ধরে মার্কসবাদ শোষিত ও বঞ্চিতদের মুক্তি এবং সমাজ জীবনে যৌথস্বার্থ চিন্তার প্রেরণা জাগ্রত করবার আহ্বান দিয়েছে, এবং বিশ্বের বহু দেশে ও অঞ্চলে এই আহ্বান বিভিন্নপ্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড প্ররোচিত করেছে। এর ফলে অনেক সমাজে বড়ো রকমের তোলপাড় হয়েছে, এবং এই সমাজদর্শনের পক্ষের ও বিপক্ষের শক্তিবর্গের মধ্যে বিশ্বধ্বংসী

মারণাস্ত্র সৃষ্টির প্রতিযোগিতা মানুষকে শিউরে দিয়েছে। কিন্তু যে সব দেশে এই সমাজদর্শনদ্বারা অনুপ্রাণিত সমাজ পরিবর্তন হয় তার কোনটাই এই দর্শনের যোগ্য হয়েছে একথা বোধ হয় বলা যাবে না। শেষ পর্যন্ত এধরণের বড়ো আকারের সামাজিক তোলপাড়ের মধ্য দিয়ে যে নতুন সামাজিক ইমারতগুলি গড়ে ওঠে তার সবকয়টিই (ছোট্ট কিউবা ছাড়া) ধসে পড়ে কিম্বা পুনরায় 'সংশোধনবাদের' দিকেই রুপান্তরীত হয়।[1] শেষ পর্যন্ত বিশ্বে বর্তমান পর্যায়ে পুঁজিবাদের একছত্র আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বিপ্লবী ধারা দিশাহারা হয়ে গেছে, এবং মানবসমাজ এই অধিপতি দর্শনের বিকল্প কোন বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবসম্মত সুস্থ[2] সমাজদর্শন এযাবৎ আর খুঁজে পায় নি যা আবার তাকে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

অন্যদিকে গত অর্দ্ধশতাব্দী ধরে 'উদারপন্থী' শিবিরের আহ্বানে ও উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী তথাকথিত 'উন্নয়নশীল' দেশগুলির 'উন্নয়নের' জন্য চিন্তা-গবেষণা ও সক্রিয় প্রচেষ্টা মবিলাইজ করা হয়, এবং এই প্রচেষ্টাও নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয়। 'উন্নয়নের' আহ্বানের প্রতিশ্রুতি ছিল বৈপ্লবিক সমাজ পরিবর্তন না করেই 'উন্নয়নশীল' দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সাফল্য এনে দেবে। এই আশায় সমাজবিজ্ঞানে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এস্টাব্লিশমেন্টসমূহে উন্নয়নের আলোচনা-বিশ্লেষণের জোয়ার এসে যায়; প্রতিশ্রুত অর্থনৈতিক সাফল্য ত্বরান্বিত করবার জন্য 'উন্নয়নশীল' দেশগুলিতে প্রবল বেগে বিদেশি "উন্নয়ন সাহায্য" বইতে শুরু করে; এবং ঘটনাটা ঘটাবার জন্য রাষ্ট্রের ওপর প্রধান দায়িত্ব অর্পিত হয় যার ফরে রাষ্ট্রের ক্ষমতা স্ফীত হতে থাকে। অর্থনীতিবিদরাই ঘটনাটার সংজ্ঞা দেবার একচেটিয়া ক্ষমতা দখল করে নেন, এবং তাঁরা 'উন্নয়নের' চূড়ান্ত সংজ্ঞা দিয়ে দেন সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাপকাঠি দিয়ে - সম্পদ ও আয় বন্টনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা ক্বচিত-কদাচিত একটি গৌণ প্রশ্ন হিসাবে স্থান দিয়ে। এসমস্ত 'উন্নয়নশীল' দেশগুলির আপামর জনগণের কাছে 'উন্নয়নে'র এই ঢাক-ঢোল সামান্যই কল্যাণ এনেছে; বরঞ্চ স্বকীয় জীবনপথের সন্ধান থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের অনেকের দুর্দশা ও অশান্তি আরো বাড়িয়েই দিয়েছে। সার্বিকভাবে সাধারণ জনগনের পার্থিব অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নি, আর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য আকাশকে স্পর্শ করেছে। উন্নয়নের নামে দেশের ভিতর থেকে এবং বিদেশ থেকে যে সব সম্পদ জড়ো করা হয়েছে তার বেশির ভাগই দুর্নীতি ও ক্রিমিনাল কার্যকলাপের কবলে পতিত হয়েছে এবং এধরণের কার্যকলাপ আশঙ্কাজনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে যে প্রতিযোগিতায় রাজনৈতিক এলিট ও সরকারী সংস্থা সমূহ তারিফ করবার মতোই নেতৃত্ব দিয়েছে। অল্প কিছু সময়ের জন্য মনে হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'মিরাক্‌ল্‌' বুঝিবা একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিল; কিন্তু এটিও 'নোজ্‌ ডাইভ' দিয়ে এধরণের ফ্লাইটের চরম ভাল্‌নারেবিলিটি স্পষ্ট করে দেখিয়েছে। আজকে 'উন্নয়ন'

---

[1] চীন তার বর্তমান সংশেশাধনবাদ নিয়েও এই জেনারালাইজেশনের একটি ব্যাতিক্রম বলে ধরা যেতে পারে - এই একটি দেশ যা সাংহাই এর নর্দমা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে একটি বিরাট জাতীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে, এবং এর জন্য মাও সে তুং-এর বিপ্লব-ই মৌলিক কৃতিত্বের দাবীদার। তবে চীনের সমাজ-দর্শণও আজকে কম্যুনাল থেকে ব্যক্তিস্বার্থের দিকে ছুটেছে।

[2] আজকে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মরণপন সঙ্গ্রামে ব্রতী হয়েছে কেবলমাত্র ধর্মীয় মৌলবাদ যা মানব সভ্যতাকে পেছনেই নিতে পারে, সামনে নয়।

-এর ওপর মানুষের বিশ্বাস কলতে গেলে আর নেই, যদিও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এস্টাব্লিশমেন্ট সমূহ এবং অর্থনীতিবিদদের মূলধারা এখনো ‘উন্নয়নের’ বাগাড়ম্বর কপ্‌চিয়ে চলেছে, এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে রাষ্ট্রের উন্নয়ন-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও ‘মুক্ত বাজার’ এই ইপ্সিত ঘটনাটি ঘটিয়ে দেবে।

৩. “দারিদ্র-বিমোচন” এবং “সস্তা-শ্রম”এর আইডিওলজি

‘উন্নয়নের’ প্রবক্তাদের হাতে এই কথাটার সংজ্ঞা এখন একটা নতুন মোড় নিয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই “উন্নয়ন’ লক্ষ্যটার প্রধান মাপকাঠি রয়ে গেছে। প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে ব্যক্তিস্বার্থের পেছনে প্রতিযোগিতার ঘোড়া দৌড়ানোর দর্শন স্থায়ী আসন পেয়ে গেছে, এবং এই দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধায় আয় ও সম্পদ বন্টনে ইকুইটির প্রশ্ন একরকম বাদই দেয়া হয়েছে। ইকুইটির জায়গায় আমরা আজকে “দারিদ্র বিমোচনের” জন্য সরব উদ্বেগ দেখতে পাচ্ছি। দারিদ্রের সংজ্ঞা দেয়া হচ্ছে জীবনের কয়েকটি তথাকথিত “মৌলিক চাহিদা” ধরে নিয়ে, যে সংজ্ঞা এব্‌সল্যুট সংজ্ঞা যা সমাজে মানুষের আপেক্ষিক পার্থিব অবস্থানজনিত আশা-আকাংক্ষা-চাহিদা-যাতনার ওপর নির্ভর করে না, অর্থাৎ অপরের শত-সহস্রগুণ বেশি আয়-সম্পদ হলেও দরিদ্রের দারিদ্র বিমোচন হয়ে যাবে, সে আর দরিদ্র থাকবে না, তার ন্যুনতম “মৌলিক চাহিদা”গুলি পূরণ হলেই। এরকম একটি ন্যুনতম এবং অপরিবর্তনীয় (স্ট্যাটিক্) অর্থে দারিদ্রের সংজ্ঞা দেবার অর্থ দাঁড়ায় মূলত: সাধারণ জনগনের শ্রমের উৎপাদনশীলতা অক্ষুন্ন রাখা, যেন তারা “গবাদি পশু” বই আর কিছু নয় যাদের ন্যুনতম খাদ্য ও মাথা গোঁজবার শেড্ যোগাতে হবে যাতে তারা তাদের শ্রম দিয়ে সমাজে ভাগ্যবানদের আয়-সম্পদ বাড়াতে পারে। সযত্ন হিসাব (একাউন্টিং)-তত্ত্বে দারিদ্রের এই ‘গবাদি পশু’-সংজ্ঞা “মানব-পুঁজি”র প্রতিপালন (মেইনটেনান্স) মাত্র নিশ্চিত করে, এবং সামাজিক আয় বন্টনের সত্যিকারের প্রশ্নটা আসে এই সংজ্ঞার ওপরের আয়টুকুকে নিয়েই! এইভাবে মানুষের দারিদ্র বিমোচনের উদ্বেগ দরিদ্র জনগনকে গবাদি পশু জ্ঞান করবার পর্যায়েই আটকে গেল, এবং এর ওপরের আয়ের বন্টনের প্রশ্নটা পাশ কাটিয়ে দারিদ্র বিমোচনের এই শোষণবাদী সংজ্ঞার বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পুঁজিবাদী দর্শনের চূড়ান্ত বিজয়ই ঘোষনা করলো। বঞ্চিত জনগনকেও দারিদ্র ও দারিদ্র বিমোচনের এই সংজ্ঞা আড়ম্বর সহকারে শেখানো হতে থাকলো যাতে তারা এতেই সন্তুষ্ট থাকে এবং এর ওপরে তাদের কষ্টার্জিত আয় অন্য শ্রেণীর হাতে পাচার হবার ইন্‌ইকুইটি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে না ওঠে। “দারিদ্র বিমোচন” যদি হয় তাহলে আর চিন্তা কী!

“বিশ্বায়নের” মধ্যে অন্তর্নিহিত যে-ধরণের বিশ্ব-উন্নয়নের দর্শণ রয়েছে তার দোসর হিসাবে “দারিদ্র-বিমোচনের” এই ধরণের উদ্বেগের তাৎপর্য কারো বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। এই দর্শনটি হল আন্তর্জাতিক পুঁজি দ্বারা ‘উন্নয়নশীল’ দেশগুলির সস্তা-শ্রম শোষণ করবার জন্য জমিন ও পরিবেশ প্রস্তুত করা, একদিকে শ্রমের মজুরী অত্যন্ত নীচুতে রেখে কর্মসংস্থান বাড়িয়ে সেটাকেই দারিদ্র-বিমোচন হচ্ছে বলে প্রতিষ্ঠিত করে, অন্যদিকে এরকম সস্তা-শ্রম-দেশে বিদেশী পুঁজি

বিনিয়োগ করে তার থেকে পুঁজির জন্য নিজের দেশের চাইতে অনেক বেশী লাভ আদায় করা। বিশ্ব-উন্নয়নের জন্য “বিশ্বায়নের” র‍্যাশনালাইজেশন এটিই, যার জন্য ‘উন্নয়নশীল’ মক্কেল দেশসমূহকে তথাকথিত ‘উন্নয়ন-সাহায্য’ দিয়ে কিনে নেওয়া হচ্ছে, এই সর্তে যে তারা দ্রুত বেসরকারীকরণের জন্য প্রয়েজনীয় সবরকম অর্থনৈতিক সংস্কার করবে এবং তাদের দেশের সস্তা-শ্রম শোষণ করবার জন্য বিদেশী পুঁজি ঢোকবার দরজা খুলে দেবে।

অদৃষ্টের পরিহাস এই যে এভাবে বেসরকারীকরণের দিকে দ্রুত এগোবার পরেও এই “গবাদি পশু”-অর্থেও দারিদ্র বিমোচন তেমন একটা কিছু হচ্ছে না, এবং নতুন শতাব্দীতে পা দিয়ে জাতীয় ও বিশ্ব-উন্নয়ন সংস্থাগুলি এই সমস্যা সমাধানের একেবারে কোন ক্লুই পাচ্ছেনা। আগে যেমন একটা পর আর একটা “উন্নয়ন দশক” ঘোষণা করা হতো কিন্তু উন্নয়ন ধরা-ছোঁওয়ার বাইরেই থেকে যেত, আজ শুধুমাত্র কোন মতে বেঁচে থাকা অর্থেই “দারিদ্র-বিমোচন” কথাটাও কেবল একটি শ্লোগান হিসাবে বারে বারে পুনর্চক্রায়িত হয়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা পণ্য হিসাবে “দারিদ্র” তার বিমোচনের আকর্ষনীয় প্রতিশ্রুতি নিয়ে ‘দরিদ্র” দেশে দেশে বিদেশী অর্থের আকর্ষনীয় স্রোত ভালোই বয়ে আনছে যা দিয়ে এসব দেশের এলিট শ্রেণী নিজেদের ধনীতর করে তাদের আধুনিক ভোগ-বিলাস স্পৃহা মেটাবার পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে, এবং এটাও আন্তর্জাতিক পুঁজির স্বার্থ-সেবা ভালোভাবেই করে যাচ্ছে দরিদ্র দেশগুলিতে তার বিলাসী পণ্যসমূহের জন্য বাজার সৃষ্টি ও স্ফীত করে। এর ফলে এসব দেশের সাধারণ জনগনের আপেক্ষিক দারিদ্র এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য বেড়ে চলেছে যার ফলে তাদের মানসিক যাতনা বেড়ে চলেছে।

এই ব্যক্তিস্বার্থ-সর্বস্ব এবং বৈষম্যবৃদ্ধিমূলক গতির ফলে সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের দ্রুত অবক্ষয় হচ্ছে। ব্যাক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক অপরাধপ্রবণতা দুইই ভয়াল গতিতে বেড়ে চলেছে। মুলত আইন-শৃঙ্খলা সংস্থাসমূহ দিয়ে এর মোকাবিলার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হচ্ছে এই সংস্থাগুলিও একই ব্যাধির কবলে পড়ছে বলে। আর জাতীয় নির্বাচনে জনগনের প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারটা সমাজকে দায়িত্বশীল অভিভাবকত্ব দেবার আগ্রহের পরিবর্তে দেশে দেশে ক্ষমতার গদি দখল করে দেশের সম্পদ আর বিদেশি “উন্নয়ন সাহায্য” আত্মসাত করবার জন্য কালো টাকা আর সন্ত্রাসের নগ্ন প্রতিযোগীতায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে।

এভাবে তীব্র থেকে তীব্রতর বঞ্চনার চেতনায় এসব দেশের জনগনের মধ্যে অদৃষ্টবাদের প্রভাবও বেড়ে চলেছে যার ফলে সমাজে ধর্মীয় মৌলবাদ ও তদ্‌জাত সন্ত্রাসের আগ্রাসনও সহজতর হচ্ছে। সমাজের প্রভুরা প্রকৃত সেবাদ্বারা যুক্তিবাদী সভ্যতার ওপর জনগনের আস্থা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা না করে কোথাও অদূরদর্শী রাজনৈতিক সুবিধাবাদী চিন্তায় ধর্মীয় মৌলবাদের সঙ্গে আঁতাত করে সমাজকে আরো পেছনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে একই সঙ্গে ‘পেছনে’র হাতে আধুনিক মারণাস্ত্র দিয়ে, কোথাও সেবা-নীতি-বিচ্যুত আইন-শৃঙ্খলা সংস্থা দিয়ে এর মোকাবিলা করবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

এসমস্তের সঙ্গে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য ও বর্বর সন্ত্রাস মানবজাতির অর্দ্ধেকাংশকে মনুষ্যত্বের সম্মান থেকে বঞ্চিত করেই চলেছে যা মানুষ জাতির সভ্যতার দাবীকেই তীব্রভাবে প্রশ্ন করে। একই সঙ্গে প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপরেও পার্থিব লালসায় মত্ত এই পৌরুষের নির্মম বর্বরতা মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির আত্মিক সম্পর্ককে ছিন্ন করে উভয়কেই বিলুপ্তির পথে নিয়ে চলেছে।

৪. সাম্প্রতিক কালে গণসচেতনতার স্ফূরণ

বিংশ শতাব্দীর এই বিরাট অভিজ্ঞতাগুলি কারো মনে হতাশার সঞ্চার করছে, কারো মনে নতুন জিজ্ঞাসা এবং নতুন চেতনার জন্ম দিচ্ছে। হতাশা নিয়ে তো সামনে এগুনো যায় না, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা ও নতুন চেতনা গ্রহণ করেই নতুন পথ সন্ধান করা যায়।

যাঁরা র‍্যাডিকাল সমাজ পরিবর্তন চেয়েছিলেন তাঁরা আশা করি বুঝেছেন যে শুধু উৎপাদন সম্পর্কে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেই শোষণের ও জনগনের ওপর আধিপত্যের অবসান হয় না, দেশে দেশে এধরণের বিপ্লবের পরে শোষনের ও আধিপত্যের রূপমাত্র বদলে নতুন ধরণের শোষণ ও আধিপত্যের অবতারণা হয়েছে (যেমন, পূর্ব ইউরোপের 'সমাজতান্ত্রিক' দেশগুলিতে)। এর একটি বড়ো কারণ পূর্বেকার শোষিত শ্রেণীর নতুন রাষ্ট্র তথা দেশব্যাপী নতুন আর্থসামাজিক কাঠামোগুলি পরিচালনায় আধিপত্য করবার জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা এবং মুল্যবোধের অভাব। সাধারণত: সমাজ-বিপ্লব পুরানো কাঠামো ধ্বংসের কাজ নিয়েই ব্যাপৃত থাকে এবং এই ধ্বংসটিকেই "বিপ্লব" বলে জ্ঞান করা হয়, কিন্তু নতুন, শোষণহীন, সুন্দর একটি সমাজ নির্মাণই যে বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য এবং এর জন্য আগে থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি না থাকলে-যে এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে সনাতম বিপ্লবী তত্ত্বে এই কথাটি উপেক্ষা করা হয়েছে। তা ছাড়া, শুধু কাঠামোগত বিপ্লব হলেই মানুষের চরিত্র বদলে যায় না, এবং পুরানো মূল্যবোধ নিয়ে নতুন কাঠামো হাতে পেলে মানুষের চরিত্রের অসুন্দর দিকটাই-যে আবার আত্মপ্রকাশ করতে পারে এরকম উদাহরণ তো কম দেখা যায় নি।

সমাজ পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা থেকে এও জানা গেছে যে বিপ্লবী "ভ্যানগার্ড"দেরও খুব সামান্য অংশই সত্যি সত্যি "শ্রেণীচ্যুত" হতে পেরেছেন, এবং এঁদের অধিকাংশই ক্ষমতায় এসে তাঁদের ক্ষমতা অপব্যবহার করে নিজেদের জন্য বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিয়েছেন সাধারণ জনগনের ("কৃষক-শ্রমিক" শ্রেণী) অনুমতি না নিয়েই। এই অর্থে তাঁরা বিপ্লবের পর একরকম 'নব্য শোষক' শ্রেণী হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করেছেন যে সম্ভাবনাও বিপ্লবী তত্ত্বে উপেক্ষা করা হয়ে এসেছে।

সবচেয়ে মৌলিক অর্থে, বিংশ শতাব্দীর সমাজ-পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা খুব স্পষ্ট করেই দেখিয়েছে যে মানুষের ব্যক্তিস্বার্থ-স্পৃহা এত সহজে যাবার নয়, এবং এই স্পৃহার ওপর সত্যিকারের কার্যকর সামাজিক অভিভাবকত্ব না থাকলে এই স্পৃহার সমাজবিরোধী চরিত্রটিই নিজেকে জাহির করে বসতে পারে। একথাও আজকে স্পষ্ট যে বিশেষ কোন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে কোন সমাজে যৌথ চেতনা প্রবলতর হলেও সেই পরিপ্রেক্ষিত বদলে গেলে (যথা, শোষনের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম করে একটা সামাজিক বিপ্লব হয়ে গেলে) পরবর্তী প্রজন্মের কাছে একই চেতনা প্রবল থাকবে এরকম কোন নিশ্চয়তা নেই। এ সম্বন্ধে পরবর্তীতে আরো কিছু আলোচনা করবো।

যে-সমস্ত 'উদারপন্থী' মহল বৈপ্লবিক সমাজ পরিবর্তন ছাড়াই বিদেশী সাহায্য নিয়ে রাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় জনকল্যানময় "উন্নয়ন" হতে পারে আশা করেছিলেন তাঁরাও জেনেছেন যে উন্নয়নের এজেন্ট জনগন ছাড়া আর যাকেই করা যায় উন্নয়ন-সম্পদের সিংহভাগ তা সে দেশী হোক্ বা বিদেশী হোক্ সেই এজেন্টই আত্মসাত করে এবং এটাই স্বভাবজাত মধ্যবিত্ত ধর্ম। সমাজতন্ত্রের ঈপ্সিত যৌথস্বার্থ চেতনা যদি সমাজে নাই থাকে এবং ব্যক্তিস্বার্থকেই যদি উন্নয়নের চালিকাশক্তি বলে স্বীকার করা হয় তাহলে রাষ্ট্রের বা অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার কর্মচারী-কর্মীরা এই চালিকাশক্তির তাড়নায় উন্নয়ন-সম্পদ নিজেদের পকেটেই আগে ভরতে চাইবেন এটাই তো স্বাভাবিক। 'গনতন্ত্র', 'জনগণের কাছে জবাবদিহিতা' ইত্যাদি গালভরা মন্ত্র দিয়ে এই প্রবণতাকে অনেকদিন অস্বীকার করবার চেষ্টা করা হয়েছে; এতদিনে এই মুখোশটা একেবারেই খুলে গেছে এবং এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ক্ষমতা ও অর্থ, প্রয়োজন হলে সন্ত্রাস, দিয়ে 'গনতন্ত্র' ও 'জবাবদিহিতা' সবই কেনা যায়। কাজেই 'উন্নয়ন' ব্যাপারটাও মরীচিকার মতো দূর থেকে প্রলুব্ধই করে গেছে, কাছে এসে ধরা দেয় নি।

সবশেষে, এও দেখা গেছে ও যাচ্ছে যে নারী ও প্রকৃতির ওপর আধিপত্য করবার 'পুরুষ স্পৃহা' সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো নির্বিশেষে অত্যন্ত গভীরভাবেই গ্রথিত, এবং দীর্ঘমেয়াদি চেতনা-উন্নয়নের প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম ছাড়া এই পুরুষ-স্পৃহা লোপ পাবার নয়[৩]।

৫. যে গণস্পৃহা আত্মপ্রকাশ করছে

কিন্তু এই সব বিফলতার মধ্য দিয়ে একটা ইতিবাচক শক্তিও এগিয়ে গিয়েছে, যেটা হল গণতন্ত্র, মানবিক অধিকার এবং সামাজিক ও পরিবেশিক ন্যায়বিচারের চেতনা। আজকে বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ স্বীকৃত, এবং যেখানে অগণতান্ত্রিক শাসন চলছে অথবা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তার কোন সামাজিক স্বীকৃতির ভণিতা আর নেই। আজকে "জনগনের রায়" যেখানে স্পষ্ট করে ব্যক্ত হচ্ছে তার বৈধতা বিশ্বস্বীকৃত হচ্ছে। নারীর অধিকার সহ মানবিক অধিকারের আন্দোলন এবং

[৩] এমন কি, শোষিত মানুষের মুক্তিকামী দার্শনিকদের মধ্যে সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ কার্ল মার্কসও এই স্পৃহার বিরুদ্ধে স্পষ্ট বক্তব্য রাখেন নি।

পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন সারা বিশ্বে এগিয়ে চলেছে। আর একদিকে যেমন করপোরেট পুঁজিবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার বলে তার আগ্রাসন বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে করপোরেট সাম্রাজ্যেরই ভেতর থেকে তার বিরুদ্ধে গনপ্রতিবাদের আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে যে আন্দোলন আজকে করপোরেট সাম্রাজ্যের শহরে শহরে স্ফুলিঙ্গের মতো আত্মপ্রকাশ করছে। এই আন্দোলনে এই প্রথম একই সঙ্গে শরীক হচ্ছে সংগঠিত শ্রমিক,কৃষক, মানবিক অধিকার-কর্মী, পরিবেশ-রক্ষা আন্দোলনের কর্মী, ছাত্র-তরুণ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং মাতা, এদের প্রত্যেক 'শ্রেণী'ই বিশ্বব্যাপী করপোরেট সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন তাদের জীবন ও জীবন-তৃষ্ণা মেটাবার পথে হুম্‌কি হয়ে যাচ্ছে এই সচেতনতায়। নিরানব্বই-এর নভেম্বরে সিয়াট্‌ল্‌ শহরে বিশ্ব-বাণিজ্য-সংস্থার বিরুদ্ধে যে অপ্রত্যাশিত অভিনব এবং তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন এই সংস্থা আয়োজিত আন্তর্জাতিক বৈঠককে বানচাল করে দিয়ে সারা বিশ্বকে চম্‌কে দেয় এই আন্দোলন একের পর এক শহরে নতুন নতুন করে আত্মপ্রকাশ করে দেখাচ্ছে-যে প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশেও বিশ্ব-শাসন-সংস্কৃতির মৌলিক পরিবর্তনের জন্য মানুষের চেতনা এগিয়ে চলেছে এবং নিজেকে প্রকাশ করবার পথ খুঁজে চলেছে। সুস্থ মানবিক মূল্যবোধের নিজেকে প্রকাশ ও জাহির করবার জন্য এরকম পথ খোঁজার মধ্যেই মানবসভ্যতার ভবিষ্যতের জন্য আশা।

এই প্রতিবাদ আন্দোলনগুলির মধ্য দিয়ে যে গণচেতনা আত্মপ্রকাশ করছে তার কয়েকটি উপাদান নিম্নরুপঃ

প্রথমত:, এই চেতনা গণতন্ত্রের একটা গভীরতর অর্থ খুঁজছে। গণতন্ত্র বলতে অনেকেই শুধুমাত্র কয়েক বছর পরে পরে জাতীয় নির্বাচন দ্বারা জাতীর শাসকগোষ্ঠী নির্বাচন মনে করে বসে আছেন, এই নির্বাচন সভ্য বা অসভ্য পদ্ধতি যেভাবেই হোক না কেন এবং নির্বাচনে বিজয়ী দল যেভাবে খুশী রাষ্ট্র পরিচালনা করুক না কেন। এরকম নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর রাষ্ট্রশাসনের খেলা দেখে সচেতন গণমানুষের স্পৃহা এখন খুব স্পষ্টই এমন একটি গণতন্ত্র চাচ্ছে যে গণতন্ত্রে (ক) সমাজের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেবার আগে সমাজের সঙ্গে সংলাপের একটা সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে যাতে রাষ্ট্র এরকম প্রশ্নে যথেচ্ছাচার করতে না পারে, এবং শুধুমাত্র চার-বছর/পাঁচ বছর পরে পরে রাষ্ট্র-পরিচালনার পরীক্ষায় 'পাশ' বা 'ফেল' করবার জন্য প্রতিযোগিতার ওপরে নির্ভর না করে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের দায়িত্ব পালনে নিজ-নিজ কন্সটিটুয়েন্সীর কাছে দায়বদ্ধ থাকবারও একটা সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া থাকবে; (খ) স্থানীয় জনগণের সর্বাধিক যৌথ স্বায়ত্বশাসনের জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হবে।

গণতন্ত্রকে গভীরতর করবার এই আহবান আন্তর্জাতিক পর্যায়েও নেয়া হচ্ছে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপ আরো গনতান্ত্রিক করবার জন্য। এটি উল্লেখযোগ্য-যে গনতন্ত্রের গভীরতর অর্থ খোঁজবার এই প্রচেষ্টা এই সব প্রতিবাদী আন্দোলনের নিজের প্রক্রিয়ার মধ্যেও প্রতিফলিত হচ্ছে - এই আন্দোলনের নিজের কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নেই, এটি একরকম

স্বত:স্ফুর্তভাবেই প্রতিবার নিজেকে মবিলাইজ করছে, এবং বিভিন্ন শহরে এই আন্দোলন চলাকালে যেভাবে সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা হচ্ছে ও বিভিন্ন সিদ্ধান্তসমূহ নেয়া হচ্ছে তা "পার্টিসিপেটরী গণতন্ত্রের" প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল - যথা, কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছাড়াই নেটওয়ার্কিং করে যাওয়া, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সিদ্ধান্তসমূহ কনসেন্সাস্ অনুযায়ী করা কারো ওপর কোনরকম চাপ না দিয়ে, এবং অংশীদারী গ্রুপগুলোকে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এরকম কনসেন্সাসের প্রতি সাধারণ আনুগত্য রেখে সৃজনশীলভাবে নিজের নিজের কর্মপন্থা নির্দ্ধারণ ও তা কার্যকর করবার সুযোগ দেয়া[৪]।

দ্বিতীয়ত: এই প্রতিবাদী আন্দোলনের চেতনা খুব স্পষ্টই বিশ্ব ও জাতীয় সম্পদের এবং আয়ের ন্যায্য বন্টনের তথা সামাজিক ন্যায় বিচারের পক্ষে। একথা বিশেষ লক্ষ্যনীয় যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের "নিউ স্টুডেন্ট মুভমেন্ট্"[৫] অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমেরিকায় এবং বিশ্বপর্যায়ে, সম্পদের বন্টনে বিরাট অসমতা প্রত্যাখান করেছে, এবং বিশ্বপর্যায়ে অর্থনৈতিক সুবিচারের দাবীর জন্য সংগ্রাম করবার জন্য মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে চলেছে। এই দাবী তো "মুক্ত বাজারের" পক্ষে কোনমতেই মেটানো সম্ভব নয়। বাস্তবিকপক্ষে, আজকে বিশ্বব্যাপী মানবতা ও পরিবেশ যে বিপর্যয়ের সম্মূখীন হয়েছে তার মূলেই রয়েছে অর্থনৈতিক সম্পদের এই বিষম বন্টন, এবং সত্যিকার গণতন্ত্রের স্পিরিট দাবী করে যে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির মীমাংসা পর্দার আড়ালে কোন "অদৃশ্য হস্ত" দ্বারা না হয়ে সামাজিক সংলাপ ও কনসেনসাসের মাধ্যমে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয়ত:, শ্রম শুধুমাত্র কর্মসংস্থান নয়, তৃপ্তিদায়ক কাজ দাবী করছে। গতানুগতিক অর্থনীতি মানুষের এই অত্যন্ত স্বাভাবিক স্পৃহাকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র অর্থ উপার্জন করাকেই শ্রমের উদ্দেশ্য বলে ধরে নিয়েছে (এ ব্যাপারে শ্রমিককে জিজ্ঞেস না করেই), এবং এরকম চিন্তা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক চিন্তারই একটি দোসর, যেন শ্রমকে মজুরী দিলেই যথেষ্ট। এই চিন্তায় জীবনের প্রধান কাজ ও পরিচয় - নিজের শ্রম (দৈহিক ও মানসিক) আমি কীভাবে ব্যায় করছি - যে একটি অনন্দদায়ক ঘটনা হওয়া প্রয়োজন এই বিচার না করে শ্রমকে খরচের খাতায় লিখে অর্থ উপার্জনকেই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলে ধরে নেয়া হয়েছে। পুঁজিবাদী চিন্তাপ্রসূত এই অমানবিক ধারণা বদলে আনন্দদায়ক শ্রমকে (সৃষ্টিশীল, সৌন্দর্য ও জ্ঞানসন্ধানী, মানুষে-মানুষে কর্মক্ষেত্রে জীবন-সমৃদ্ধিকারী সহযোগীতা ইত্যাদি) জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য মনে করবার মানুষের স্বাভাবিক চাহিদাকে স্বীকৃতি দেবার জন্য অর্থনীতির পূরো চিন্তাধারাই (প্যারাডাইম)ই বদলানো প্রয়োজন। বিশেষ করে উন্নয়ন সংলাপে শুধুমাত্র মানুষের কর্মসংস্থান তথা আয় বৃদ্ধির দিকে না তাকিয়ে কিরকম শ্রম দিয়ে মানুষের আয় বৃদ্ধি হচ্ছে এই বিবেচনা আনা অত্যন্ত প্রয়োজন। একই সঙ্গে দারিদ্র-বিমোচন সংলাপে মানুষের মৌলিক চাহিদার যে ধারণা রয়েছে তারও পুনর্বিবেচনা

---

[৪] দ্রষ্টব্য: স্টিফেন গিলুড (সম্পাদিত): ভয়েসেজ ফ্রম দি ডব্লিউ,টি,ও, এন এনথলজি অব রাইটিংস্ বাই দি পিপল্ হু সাট ডাউন দি ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন ইন সিয়াট্ল্ ১৯৯৯. দি এভারগ্রীণ স্টেট কলেজ বুক স্টোর. ২০০০।
[৫] লিজা ফেদারস্টোন: দি নিউ স্টুডেন্ট মুভমেন্ট. ওয়েবসাইট।

করে আনন্দদায়ক শ্রমদ্বারা নিজেকে চরিতার্থ করা, নিজের আত্মপরিচয় দেয়া, জীবনে নিজেকে সমৃদ্ধ করবার যে সহজাত স্পৃহা মানুষের রয়েছে এগুলিকে মানুষের মৌলিক চাহিদা ও দারিদ্রের সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরী[৬]।

চতুর্থত:, আজকের সচেতন মানুষের মধ্যে পরিবেশের সংরক্ষণ ও পরিচর্যা যা সনাতনী সমাজ পরিবর্তনের সংলাপে স্থান পায় নি, এ সম্বন্ধে চেতনা সুস্পষ্ট, এবং করপোরেট পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রতিবাদী আন্দোলনে এই দাবী সামনের সারিতে স্থান পেয়েছে।

প্রতিবাদী আন্দোলনসমূহের এই সুস্পষ্ট দাবীগুলি ছাড়া আরো দুটি দাবী এদের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে। এই আন্দোলনগুলিতে নারীর ভূমিকা প্রথম সারিতে, এবং এইভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নারী সমাজক্রিয়ায় তার সমান অধিকারের দাবীও ব্যক্ত করেছে। একইরকমভাবে ছাত্র এবং তরুণরা এই আন্দোলনসমূহে অত্যন্ত লক্ষ্যনীয় ভূমিকা রেখে এই দাবীই ব্যক্ত করেছে যে তারা তাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র ও “মুক্ত বাজারের” হাতে যেমন নিরাপদ মনে করছে না তেমন মুরুব্বীদের হাতেও না। প্রতিবাদী আন্দেলনসমুহে এই দাবীটি যদিও অনুক্ত তথাপি স্পষ্ট যে ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করবে এরকম সিদ্ধান্তসমূহ নেবার প্রক্রিয়ার ভবিষ্যতের প্রতিনিধিদেরও সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

৬. সমাজ রূপান্তরের পথ-সন্ধান

বলা বাহুল্য অধিপতি বিশ্বদর্শনের বিরুদ্ধে এরকম প্রতিবাদী আন্দোলন সমূহ কোন দেশেই সমাজ রূপান্তরের জন্য যথেষ্ঠ নয়, বিশ্বমঞ্চে করপোরেট-পুঁজিবাদী আধিপত্যের মোকাবিলা করবার জন্য তো নয়ই। সমাজ রূপান্তর একটি বড়ো ধরণের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। কিন্তু বর্তমান পর্যায়ে প্রগতিশীল রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিশ্বাসযোগ্যতা অত্যন্ত নীচু পর্যায়ে। গত শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষাসমূহের বিলোপ অথবা বিকৃতির পরে আজকে বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক শিবির বিভ্রান্ত, তার তাত্ত্বিক দর্শণ নানা প্রশ্নের সম্মুখীন - যার কয়েকটি ওপরে বর্ণিত গভীরতর গনতান্ত্রিক চেতনার এবং নারী, প্রকৃতি ও তরুণ সমাজের অধিকার সম্বন্ধে চেতনার বিকাশের মধ্যে রয়েছে এবং আর কয়েকটি আমি পরবর্তীতে উল্লেখ করব -, এবং তার প্রায়োগিক তত্ত্ব বলতে বর্তমানে তেমন আর কিছু নেই। অনেক প্রাক্তণ সমাজতন্ত্রীই এই শিবির পরিত্যাগ করেছেন, এবং যারা রয়ে গেছেন তারা একটা দিশাহারা অবস্থায় রয়েছেন, তাদের কেউ কেউ এখনো উনবিংশ শতাব্দীর মার্কসবাদের “শোষণমুক্ত সমাজ” প্রতিষ্ঠার শ্লোগানই দিয়ে চলেছেন যার বিশ্বাসযোগ্যতা আজকে বিলুপ্ত। এরকম দিশাহারা অবস্থায় সমাজ রূপান্তরের জন্য রাজনৈতিক তৎপরতার কোন বিশ্বাসযোগ্যতা বর্তমানে নেই। অপরদিকে “গনতন্ত্র”, “উন্নয়ন”, “দারিদ্র বিমোচন” “বিশ্বায়ন”

---

[৬] রিসার্চ ইনিয়েটিভস্‌ বাংলাদেশ (রিইব)-এর অভিষেক পেপার *কনসেপশন এন্ড রিসার্চ আইডিয়াজ অব্ রিব্* (মে ২০০২)-এ এই বিবেচনার বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

ইত্যাদি শ্লোগানেরও অসারতা সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে আসছে। এই অবস্থায় আজকে বর্তমান পর্যায়ে, যেখানে সম্ভব সেখানে, শোষিত ও বঞ্চিত জনগণের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে তাদের বর্তমান সামগ্রিক কঠিন অবস্থার মধেই এগিয়ে যাবার স্থানীয় সংগ্রাম ও প্রচেষ্টায় সম্পৃক্ত হয়ে তাদের বাস্তব জীবন সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হওয়া, তাদের নিজস্ব পবিরবেশে প্রগতিশীল চেতনা ও কর্মকান্ডে উজ্জীবিত করা এবং এই প্রচেষ্টায় তাদের জীবনের স্পৃহা, শক্তি ও সম্ভাবনা বাইরে থেকে অনুমান না করে বাস্তব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অনুধাবন করা এবং তার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর পরিসরে সমাজ রূপান্তরের দর্শণ ও তত্ত্বগত দিকনির্দেশ এবং বাস্তব পথ খোঁজা, সমাজ-রূপান্তরকামী বুদ্ধিজীবি ও সমাজকর্মীদের প্রধান কাজ বলে আমার প্রস্তাব।

বিশ্বের নানা স্থানে বুদ্ধিজীবি-সমাজকর্মীরা এধরনের কাজে সম্পৃক্ত রয়েছেন। বাংলাদেশেও বিক্ষিপ্তভাবে এধরণের কাজ চলছে বলে শোনা যায় যার মধ্য দিয়ে দেশের শোষিত ও বঞ্চিত জনগনের কঠিন বাস্তবতার মধ্যেও আত্মসন্মান ও আত্মশক্তিতে এগিয়ে যাবার স্পৃহা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যেতে পারে[৭]। এধরণের কাজের সঙ্গে তাত্তিক্ব বুদ্ধিজীবিদের মিলন উভয় পক্ষকেই সমৃদ্ধ করতে পারে একথার সঙ্গে আশা করি কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না। এদেশের তাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবিদের জনগনের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দৈনন্দিন প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হবার তেমন একটা ট্রাডিশন এখনো গড়ে ওঠে নি যেমন হয়েছে লাতিন আমেরিকার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি ধারায় - “এক্শন রিসার্চ” এবং পাওলো ফ্রেইরিয়ান ধারা -, যেমন হয়েছে ভারতে গান্ধীবাদী ধারায়, যেমন হয়েছে কেরালায় বামপন্থী বুদ্ধিজীবিদের নেতৃত্বে দীর্ঘকালব্যাপী পরিচালিত অভিনব “সায়েন্স ফর সোসাল রিভল্যুশন” আন্দোলনে, যেমন হয়েছিল চীনে “মে ৪” আন্দোলনে যে আন্দোলন থেকেই চীনের বিপ্লবী ধারা বেরিয়ে আসে। গিনি বিসাও-তে সমাজ-বিপ্লবের পরে আমিলকার কেব্রালের আমন্ত্রণে পাওলো ফ্রেয়রি সে দেশে যেয়ে সে জাতির আত্মঅনুসন্ধানী গণশিক্ষার প্রক্রিয়ায় মূল্যবান অবদান রাখেন। বর্তমান লেখক আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থায় কর্মরত থাকাকালে বিপ্লবী নিকারাগুয়ায় তাঁর উদ্যোগে দরিদ্র কৃষক-অধ্যুসিত *এল রিগাদিও* অঞ্চলে স্থানীয় গনসংগঠনসমূহ দ্বারা পরিচালিত গণগবেষণার একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়[৮], এবং এই অভিজ্ঞতায় অনুপ্রাণিত হয়ে সে দেশের জাতীয় ক্ষুদ্র কৃষক ও গবাদি পশু পালকদের সংগঠন “উনাগ” বিপ্লবী সরকারের অনুমোদন নিয়ে বর্তমান লেখককে সে দেশে সারা দেশব্যাপী গণগবেষণার একটি জাতীয় প্রকল্প নির্মাণ ও পরিচালনায় সহায়তা করতে আহ্বান করে; দু:খের

---

[৭] যথা, “দি হাঙ্গার প্রজেক্ট”এর কিছু কাজ, কুষ্টিয়ার ‘কম্যুনিটি পেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট’-এর কাজ, এবং এধরনের বাইরে থেকে কোনরকম অর্থসাহায্য না দিয়ে দরিদ্র জনগনকে নিজেদের সম্মিলিত শক্তি-সামর্থ-উগ্যোগ নিয়ে এগিয়ে যাবার জন্য ‘এনিমেটরের’ কাজের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যে সমস্ত উদ্যেগ স্টাডি করা প্রয়োজন।

[৮] *পার্টিসিপেটরী রিসার্চ ইন নিকারাগুয়া, রিপোর্ট অন এ পাইলট প্রজেক্ট”*, মালেনা দ্য মনতিস্, আন্তর্জাতিক শম সংস্থা (মিমিও), বর্তমান লেখক কতৃক স্প্যানিশ ভাষা থেকে অনূদিত, জেনেভা, মে ১৯৮৫। অভিজ্ঞতাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য বর্তমান লেখকের *পিপলস্ সেল্ফ-ডেভেলপমেন্ট*, জেড বুকস্ ও ইউ,পি,এল (১৯৯৩, , পৃ ১৪৬-১৪৭ দেখুন।

বিষয় আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার গভর্নিং বডির পুঁজিবাদী চক্রের বিরোধীতায় এই প্রকল্প জন্ম নিতে পারে নি।

আজকে বিশ্বব্যাপী একটি "পার্টিসিপেটরী রিসার্চ" [পি,আর বা পি,এ,আর (*পার্টিসিপেটরি একশন রিসার্চ*)] আন্দোলন চলছে যে আন্দোলনে বুদ্ধিজীবিরা জনগনের সঙ্গে সহ-গবেষণায় সামিল হয়েছেন এবং বঞ্চিত ও শোষিত জনগনকে আত্ম-অনুসন্ধান দ্বারা তাদের নিজস্ব সমাজ-জ্ঞান এগিয়ে নিতে এবং তাদের মধ্যে "অর্গানিক ইনটেলেকচুয়াল" সৃষ্টিতে সহায়ক ভুমিকা পালন করছেন। এধরণের কোন আন্দোলনই আজো বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবি ধারাকে স্পর্শ করে নি যে ধারা মূলত: কেতাবী সমাজ-রুপান্তরের তত্ত্ব এবং নিজেদের মধ্যে সেমিনার-মিটিং করে এ বিষয়ে সংলাপ নিয়েই মগ্ন যে তত্ত্ব এবং সংলাপ গনজীবনের সামনে এগিয়ে যাবার স্পৃহা ও প্রচেষ্টা এবং তদৃজাত অন্তর্দৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং এই পথে আজকে কোন দিকনির্দেশনা আর দিতে পারছে না। ভারত উপমহাদেশেরই অংশ বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে জনগনের জীবন-পথ সন্ধানে এরকম বিচ্ছিন্নতা কেন হল এই প্রশ্ন নিজেই অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক; তবে এই বিচ্ছিন্নতা দূর না হলে এদেশের বুদ্ধিজীবিরা সমাজ-রুপান্তরের প্রশ্নে তেমন কার্যকর কোন অবদান রাখতে পারবেন বলে আশা করবার যুক্তি স্পষ্ট নয়।

৭. কয়েকটি প্রশ্ন

সবশেষে সমাজ-রূপান্তরের প্রশ্নে আমার ওপরের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে এবং নতুন কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করে বর্তমান নিবন্ধের ইতি টানবো:

১. ব্যাক্তিস্পৃহা বনাম যৌথ স্পৃহা: মার্কসবাদে অনুপ্রাণিত সমাজ-রুপান্তরের দর্শনে ব্যক্তিউদ্যোগের ক্রমশ: বিলুপ্তি ও যৌথ উদ্যোগের উত্তোরোত্তর প্রাধান্যের চিন্তা প্রাধান্য পেয়েছে। বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রের পরীক্ষায় যৌথ উদ্যোগ কোন দেশে মানুষের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, কোন দেশে মানুষকে এদিকে নানাভাবে প্ররোচিত বা প্রণোদিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে যে মানুষ বাধ্য হয়ে অথবা প্ররোচিত/প্রণোদিত হয়ে কিছুকাল যৌথ উদ্যোগে শরীক হলেও একটা পর্যায়ে ব্যাক্তিউদ্যোগের দিকে 'পিছিয়ে' গিয়েছে, যেখানে যৌথ উদ্যোগে যত বেশী বাধ্য করা হয়েছে সেখানে ততো বেশি জোরে 'প্রতিবিপ্লব' করে। এর থেকে ইতিহাস যেন এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে মানুষের মধ্যে ব্যক্তি-উদ্যোগের প্রবণতা বেশ গভীর, অন্তত: যে সমাজে মানুষ 'প্রিমিটিভ্ কম্যুনিজম'-এর পর্যায় পার হয়ে এসেছে - অন্যভাবে বোধ হয় বলা যায় যে সমাজে মানুষ ইনট্যুইটিভ্ চিন্তার আধিপত্য ছাড়িয়ে র‍্যাশনাল চিন্তার আধিপত্যের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। র‍্যাশনাল চিন্তা করে প্রত্যেক মানুষ তার ব্যক্তিগত বাস্তবতা (রিয়ালিটি) তৈরি করে যে বাস্তবতা সাধারণত: অপরের ব্যক্তিগত বাস্তবতা থেকে ভিন্ন। এরকম ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত বাস্তবতা নিয়ে মানুষ যৌথ

উদ্যোগকে সব অবস্থায় প্রাধান্য দিয়ে যাবে এরকম আশা করা যায় না। কোন বিশেষ অবস্থায় বিভিন্ন মানুষের ব্যাক্তিগত বাস্তবতার প্রধান চরিত্র কাছাকাছি হতে পারে যে কারণে একাধিক মানুষ নিজের নিজের বাস্তবতা অনুযায়ীই যৌথ উদ্যোগে নিজের নিজের ব্যাক্তিগত লাভ জ্ঞান করতে পারে, যেমন একটি চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সবাই মনে করতে পারে-যে সকলের সম্পদ একত্র পুল্ করে প্রত্যেকেই একা যতোটা পারে তার চেয়ে আর একটু দ্রুত সামনে এগুতে পারে। কিন্তু সেই বিশেষ অবস্থার অবসান হলে (প্রত্যেকের অবস্থা একটু স্বচ্ছল হলে) সেই মানুষগুলিই মনে করতে পারে যে এখন তাদের পক্ষে একা একা নিজের নিজের ব্যাক্তিগত লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হওয়াই বেশি লাভজনক। এ কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে ব্যক্তিগত লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য মানুষ সম্পদের ব্যাক্তগত মালিকানাও চাইবে। এটা থেকে পুরোপুরি পুঁজিবাদ সমর্থিত না হলেও সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা এবং তার ব্যবহার দ্বারা ব্যাক্তি উদ্যোগ সমর্থিত হয়। সামাজিক সিদ্ধান্তের জন্য যে দুটো প্রধান প্রশ্ন থেকে যায় সেদুটি হল ক্ষুদ্র মালিকানা ও উদ্যোগ (আন্টারপ্রনিয়রশিপ্) বনাম বড়ো মালিকানা ও উদ্যোগের প্রশ্ন, এবং অপরকে শোষণ করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির বিরুদ্ধে সামাজিক অভিভাবকত্বের প্রশ্ন। কিন্তু সমাজতন্ত্র-দর্শনের যৌথ উদ্যোগ তথা সমাজের যৌথ মালিকানা এই উপাদানটি বড়ো জোর সমাজের কোন এক পর্যায়ের সাময়িক প্রয়োজন হিসাবেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে, সর্বকালের জন্য নয়। অর্থাৎ উৎপাদনযন্ত্রের যৌথ (সামাজিক) মালিকানা-দর্শণধারী 'সমাজতন্ত্র' বড়ো জোর কোন র‍্যাশনাল সমাজের উন্নয়নের পথে বিশেষ কোন পর্যায়ের জন্যই সিদ্ধ হতে পারে, সর্বকালের জন্য নয়।

২. জ্ঞানসম্পর্ক,আধুনিক প্রযুক্তি এবং গনশিক্ষা: মার্কস ও এঙ্গেল্‌স্ বলেছিলেন যে সমাজে যে শ্রেণী বৈষয়িক উৎপাদন-উপাদান সমূহের মালিকানা ভোগ করে সেই শ্রেণীই জ্ঞান উৎপাদনের উপাদান সমূহের ওপরও কতৃত্ব করে[৯]। যে কথাটা তাঁরা বলেন নি তা হল এই কথা "বিপ্লব"-পূর্ব সমাজের জন্য সত্য হলেও "বিপ্লব" পরবর্তী সমাজের জন্য আপনা থেকে সত্য হয় না - বিপ্লব-পরবর্তী সমাজে বৈষয়িক উৎপাদন-উপাদানসমূহের মালিকানার পুনর্বন্টন হলেও জ্ঞান উৎপাদনের উপাদান সমূহের মালিকানা বিপ্লবপূর্ব অধিপতি "জ্ঞানী শ্রেণী"র কাছেই থেকে যেতে পারে যদি না নতুন সমাজে সচেতনভাবে জ্ঞান-সম্পর্কেরও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়, এবং জ্ঞান-সম্পর্কে এই অসমতা থেকে গেলে নতুন সমাজেও জ্ঞানী শ্রেণীই শ্রমিক শ্রেণীর ওপর আধিপত্য করে যেতে পারে। আমরা রুশ বিপ্লবের ওপর চার্লস বেথেলহেমের মনুমেন্টাল গবেষণা থেকে জানি অক্টোবর বিপ্লবের পর রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী কী ভাবে প্রাযুক্তিগত ও ম্যানেজমেন্টগত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাবে একের পর এক খাতে বুরোক্র্যাট ও টেকনোক্র্যাট্‌দেরর কাছে আত্মসমর্পন করে যায় যার ফলে শেষ পর্যন্ত "শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের" বদলে বুরোক্র্যাট-টেকনোক্র্যাট শ্রেনীরই একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়[১০]। লেনিনের "অগ্রসর-চিন্তাধারী বিপ্লবী বুদ্ধিজীবি" - তত্ত্বও এরকম সম্ভাবনাকে জোড়দার করে

---

[৯] মার্কস ও এঙ্গেলস্: ফুয়েরবাখ, অপোজিশন টু দি ম্যাটেরিয়ালিষ্ট এন্ড আইডিয়ালিষ্ট আউটলুক, মস্কো, ১৯৭২, পৃ ৫১।
[১০] চার্লস বেথেলহেম: *ক্লাশ স্ট্রাগলস্ ই দি ইউ,এস,এস, আর,* মান্থলি রিভ্যু প্রেস, ১৯৭৬।

একথাও প্রস্তাব করা যায়[11]। মাও সে তুং বিপ্লবী চীনে বৈষয়িক উৎপাদন সম্পর্ক উল্টে দেবার পরে জ্ঞান উৎপাদন সম্পর্ককেও উল্টে দেবার চেষ্টা করেন সনাতন ধারণায় "জ্ঞানী" শ্রেণীকে গনমানুষের কাছে গিয়ে জ্ঞানশিক্ষা নিতে বাধ্য করবার চেষ্টা করে; এই প্রচেষ্টায় তিনি সফল হয়েছিলেন একথা বলা যায় না, এবং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পার্টির মধ্যে সনাতন "জ্ঞানী" শ্রেণীর 'ক্যু' হয়ে এই প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটে। জ্ঞান, এবং জ্ঞানের ওপর 'মালিকানা' একটি সামাজিক শক্তি। আজকে বিশ্বে আধুনিক প্রযুক্তির - বিশেষ করে কম্পিউটার ও আই,টি - যে বৈপ্লবিক অগ্রগতি হয়েছে এবং সেই তুলনায় আমাদের মতো দেশের শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর শিক্ষা ও প্রাযুক্তিক দক্ষতা যে স্তরে রয়েছে তাতে এরকম সমাজে জ্ঞানসম্পর্ক আরো অনেক বেশি অসম হয়ে গেছে এবং যাচ্ছে, এবং এই অবস্থা থাকলে সমাজ রূপান্তরের লক্ষ্য হিসাবে গনমানুষের হাতে সমাজের ক্ষমতার হস্তান্তর একটি অবাস্তব স্বপ্নই থেকে যাবে। এই জ্ঞান-সম্পর্কে বৈপ্লবিক পরিবর্তন না হলে যে কোন রকম সমাজ রূপান্তরেই দেশের সনাতন "জ্ঞানী" শ্রেণীই গণমানুষের ওপর প্রভুত্ব করে যাবে, এবং এই শ্রেণী স্বভাবত:ই প্রধানত: নিজেদের স্বার্থেই তাদের এই ক্ষমতা ব্যবহার করে যাবে। অর্থাৎ দেশের গনমানুষের প্রকৃত স্বার্থে সমাজ রূপান্তরের যে কোন উদ্যোগে সর্বপ্রথম গনমানুষকে আধুনিক প্রাযুক্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলবার জন্য এবং সেই উদ্দেশ্যে কম্পিউটার তথা আই,টি-তে যথাযথ পারদর্শিতা অর্জন করতে সাহায্য করবার জন্য একটি সামাজিক আন্দোলন কী প্রয়োজন নয়?

আমার আশা করতে ইচ্ছে হয় যে "সমাজ-রুপান্তর ফোরাম" দেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি-ছাত্রসমাজকে সম্পৃক্ত করে দেশের গণমানুষকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করবার জন্য একটি সামাজিক আন্দোলনের আহবান এবং তাতে নেতৃত্ব দেবে। আমি বিশ্বাস করি যে এটি সম্ভব, এবং এই পূর্বশর্ত ছাড়া এদেশে গণমানুষের প্রকৃত স্বার্থে কোন রকম সমাজ রূপান্তরই সম্ভব বলে আমার মনে হয় না।

৩. মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক মূল্য: সবশেষে, যাঁরা সমাজ-রূপান্তর বলতে মার্কস-লেনিনের দর্শন-অনুযায়ী সমাজ-বিপ্লব চান তাঁদের বছর আটেক আগে আমি একটি প্রশ্ন রেখেছিলাম যে প্রশ্ন আবার রাখছি:

"আজকের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে একটি প্রশ্নের আমূল পুনর্বিবেচনা করতে হবে। এই প্রশ্নটি হল উন্নয়ন যাত্রায় প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও শ্রমজীবিদের মধ্যে সম্পর্ক কী হবে। সমাজতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি ছিল সমাজতন্ত্রের উত্তরণের পথে শ্রমজীবিদের একনায়কত্ব, কিন্তু বাস্তবে যা হলো তা শ্রমজীবি শ্রেণীর নামে মধ্যবিত্তদের একনায়কত্ব। বোধ হয় প্রতিশ্রুতিটিই অবাস্তব ছিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভ্যানগার্ড যদি বিপ্লবী মধ্যজীবিরা হয় তাহলে এই শ্রেণী

---

[11] এই কথাটি আমি আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি আমার "গন গবেষনা ও সমাজপরিবর্তন" প্রবন্ধে (*উন্নয়ন জিজ্ঞাসা*, ব্র্যাক প্রকাশনা, ১৯৯২)।

কি স্বেচ্ছায় নিজেদের ক্ষমতা শ্রমজীবিদের কাছে হস্তান্তর করবে? এরকম অসাধারণ নি:স্বার্থ বিপ্লবী মধ্যজীবি যদি বা ইতিহাসের একলগ্নে জন্মে থাকে, এই মানসিকতা মধ্যবিত্তদের পরবর্তী প্রজন্মকেই কি করে দেয়া যাবে? সমাজতন্ত্রে উত্তরোণের পথে যদি মধ্যবিত্তদের জ্ঞান ব্যবহারের প্রয়োজন থেকেই যায় তাহলে কি তাদের শ্রমজীবিদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নেবারও দাবী থেকে যায় না? এই দাবীটিকে নীতিগতভাবে অস্বীকার করে দু' শেণীর মধ্যে বৈরি দ্বন্দ্ব ঘোষণা করে মধ্যবিত্তবিত্তদের হাতেই ক্ষমতার চাবিটি প্রথমে দিয়ে তাকে শ্রেণীচ্যুত হতে বলা কি একটি অবাস্তব রোমান্টিক(ইউতোপিয়) চিন্তা নয়? আমার প্রস্তাব মধ্যবিত্ত শ্রেণী কোনদিনই স্বেচ্ছায় তাদের ক্ষমতা ছাড়বে না, বিপ্লবী মধ্যবিত্তরাও নয়, এবং তাদের সাহায্য ছাড়া যদি সমাজতন্ত্র হতে না পারে তাহলে সমাজতন্ত্রকেও তাদের একটা ন্যূনতম মূল্য দিতে হবে প্রকাশ্যে ও নীতিগতভাবেই যাতে বৈরী দ্বন্দ্বটি অবৈরী দ্বন্দ্বে রুপান্তরীত হয়ে দু' শ্রেণীর মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন সমাজ গঠনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে।"[১২]

আমার আট বছর আগের এই বক্তব্যের সঙ্গে আজকে শুধু এটুকু যোগ করবো যে মধ্যবিত্তশ্রেণীকে তাদের জ্ঞানের জন্য এবং সমাজকে অন্যান্য অবদানের জন্য সমাজ কী মূল্য দেবে এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া বাঞ্ছনীয় সামাজিক সংলাপের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং সামাজিক সিদ্ধান্ত হিসাবে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী তথা "বিপ্লবী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি"দের কতৃত্বাধীন কোন "সমাজতান্ত্রিক" বা "কম্যুনিষ্ট" পার্টি এককভাবে নিজেদের ক্ষমতা খাটিয়ে নিজেদের সামাজিক মূল্য নির্দ্ধারণ করবে না। এর জন্য এই "জ্ঞানী" মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণমানুষকে বোঝাতে হবে তাঁদের জ্ঞান গণমানুষের কতখানি কাজে লাগবে এবং তার জন্য তাঁদের কী পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা-ক্ষমতা প্রাপ্য হওয়া উচিত। এবং এটিই হবে "সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র" তথা সত্যিকার গণ-তন্ত্রের "এসিড্ পরীক্ষা"।

---

[১২] "উন্নয়ন অর্থনীতির সংকট", ১৫শে সেপ্টেম্বর '৯৪ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে প্রদত্ত ড. আখলাকুর রহমান স্মারক বক্তৃতা, পুনর্মুদ্রিত *একুশে ও স্বাধীনতা, বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ-বাস্তবতা,* এডর্ন পাবলিকেশন ২০০২।